এক 'চরিত্রহীন' সমবায়ের কথা

আমাদের সময়ে স্কুল কিংবা কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেডমাস্টার মশায় কিংবা প্রিন্সিপালের কাছ থেকে ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট জোগাড় করার একটা হিড়িক পড়ে যেত। এই সব সার্টিফিকেট পরবর্তীকালে কোনো চাকরির দরখাস্তে জুড়ে দিতে হবে বলে আমরা জানতাম। বাঁধা গতের ওই সব ক্যারেক্টর সার্টিফিকেটেরই শেষ লাইনটা থাকত 'হি বেয়ারস্ গুড মরাল ক্যারেকটার' অর্থাৎ তার নৈতিক চরিত্র ভালো। তখন এই নৈতিক চরিত্রের বিষয়টা খুব একটা যে বুঝতাম তাও নয়, আর তা বোঝার কোনোদিন চেষ্টাও করিনি। সার্টিফিকেটগুলো ভালো করে গুছিয়ে রেখে দিতাম ভবিষ্যতের কাজে লাগবে বলে। পড়াশুনা শেষ করে তখন আমি অধ্যাপনার কাজে যুক্ত রয়েছি। বলতে গেলে জীবনে সেই প্রথম 'নীতি নৈতিকতার' নতুন পাঠ নিতে হলো আমাকে। আর যে কারণে এই নৈতিকতার বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলাম তা যে জীবনে কোনোদিন ঘটতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

সময়টা ১৯৯৫ সাল, মাস জানুয়ারি, স্থান, শহর কলকাতা। ভোরের কুয়াশা তখনও পুরো কাটেনি, তারই ফাঁক দিয়ে সকালের নরম রোদ্দুর শহরবাসীদের ঘরের ছাদ, দেওয়াল, জানালা ছাপিয়ে ঢুকে পড়েছে মনের আঙিনায়। আমরা ক'জনা সেদিন তড়িঘড়ি হাজির হয়েছিলাম রাজ্য সরকারের কো-অপারেটিভ বা সমবায় দপ্তরে। আমরা অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ (যেখানে আমি শিক্ষকতা করতাম)-এর দু'জন আর আমাদের সঙ্গে ছিলেন তিনজন মহিলা, যারা পেশায় যৌনকর্মী। অর্থাৎ যে সব মহিলারা যৌন পরিষেবা বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন করে। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম, ফলে সমবায় অফিসের সামনে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর, অফিসের দরজা খোলা হলো, তারপর ঘরে ঝাঁট পড়ল, আলো জ্বলল, বাবুর টেবিল ঝেড়ে বেয়ারা যখন খবরের কাগজ, জলের গ্লাস সাজিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে মোটামুটি আরও আধঘণ্টা কেটে গেলেও আমরা ধৈর্য হারাইনি। প্রায় একমাস হলো দরখাস্ত জমা পড়েছে বড়োবাবুর ঘরে। মাঝে বার দুয়েক তদ্বির করার পর অ্যাপয়েন্টমেন্টটা মিলেছে, তাই সবাই উত্তেজনায় ভরপুর, এবার তাহলে সমবায় সমিতি তৈরির অনুমতি মিলবে। বড়োবাবু খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে আমাদের একবার পরখ করে নিলেন, তারপর চোখ নামিয়ে আবার কাগজে মনোনিবেশ করলেন। একটুখানি নীরবতা, ফের আবার চোখ তুললেন তিনি। এবার আস্তে আস্তে তাঁর দৃষ্টিটা প্রসারিত করলেন দূরের জানলার দিকে। আমরা নিস্তব্ধ। মেঝেতে পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে, আমি তখন একটু উস্‌খুস্ করতে শুরু করেছি। এবার তিনি নীরবতা ভঙ্গ করে বেশ মোলায়েম স্বরে শুরু করলেন, 'আপনাদের দরখাস্ত সবই ঠিক আছে দেখেছি, ফর্মটা বোধহয় আপনারা ভরে দিয়েছেন?' বলে তিনি আমাদের দিকে চোখ ঘোরালেন। তারপর একটুখানি বিরতি নিয়ে... 'তবে এই সমবায় গড়ার অনুমতি আমরা দিতে পারব না।'

আমরা তখন প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছি—কেন? কেন? ... এবার তিনি বিস্তারিত হন— 'সমবায় আইন অনুযায়ী সমবায় যারা গঠন করবেন তাদেরকে চরিত্রবান হতে হবে।' আমরা স্তব্ধ ও হতবাক। নীরবতা ভাঙতে আমিই এবার শুরু করলাম, 'ও আচ্ছা আপনি তাহলে বলছেন, প্রত্যেকের নামে একটা ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে? কিন্তু এরা তো সেই কবে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। অনেকে স্কুলের পড়াশুনা শেষও করেনি, এখন কি আর হেডমাস্টার মশায় ওদের ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট দেবেন?' আমার কথা শেষ হতে না হতেই ভদ্রলোক ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'না না আমি সে সব সার্টিফিকেটের কথা বলছি না, বেশ্যাদের আলাদা কোনো সার্টিফিকেটের দরকারও নেই, তারা তো সব যৌনকর্মী পরিচয় দিয়ে যখন ফর্ম ভর্তি করেছে তখন আর নতুন করে ''চরিত্রের'' শংসাপত্রের দরকার পড়ে কি? 'আমাদের মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, কি উত্তর দেব ভেবে কুল পাচ্ছিলাম না। সেই অবস্থায়

যৌনকর্মীদের মধ্যে একজন আমতা আমতা করে বলতে শুরু করল 'আমাদের দোষটা কি শুনি?' সঙ্গে আর একজন যোগ করল, 'আমরা কি চুরি-চামারি করি, নাকি ঘুষ খাই তাহলে ...।' সত্যি কথা বলতে কি, সেদিনই প্রথম এই 'নৈতিক চরিত্রের' বিষয়ে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলেছিল। বড়োবাবু চোখ কটমট করে যে ভাবে তাকালেন তাতে আর কথা বেশিদূর এগোয়নি। তবে যৌনকর্মীরা সেদিন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলেও থেমে থাকেননি। যে বিতর্ক তারা সেদিন সমবায় দপ্তরে তুলেছিলেন তা গড়াতে গড়াতে একদিন পৌঁছে গিয়েছিল সমবায় মন্ত্রীর দোরগোড়া পর্যন্ত। নীতি নৈতিকতার এই বিতর্ক যৌনকর্মীদের ধমক দিয়েও থামানো যায়নি। যৌনকর্মী আর সমবায় দপ্তরের মধ্যেকার এই বিতর্ক চলেছিল টানা কয়েকমাস। যৌনকর্মীদের সোজাসাপটা যুক্তি ছিল 'যখন গতর খাটিয়ে শ্রম দিচ্ছি, কাস্টমারকে পরিষেবা বিক্রি করছি তখন কোন্ যুক্তিতে আমরা ''চরিত্রহীন''?' আমরা কাস্টমারদের বিনোদন দিয়ে থাকি, জোরজুলুম করি না, খুন-খারাপি করি না, লোক ঠকাই না, আমরা রোজগার করি পেট ভরানোর জন্য, ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য। আমরা সংসার চালাই নিজেদের রোজগারের পয়সা দিয়ে, তাহলে দোষটা কোথায়?

বড়োবাবু এসব শুনতে নারাজ থাকলেও ওই দপ্তরের অনেকেই যৌনকর্মীদের জীবন-জীবিকার বিষয়গুলো বুঝতে চেয়েছে ধীরে ধীরে। অনেকে প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে জানতে চেয়েছে তাদের জীবন আর পেশাকে ঘিরে নানান ধরণের সংঘাত আর সমস্যার কথা। আর সেই আলোচনার অবসরে তাদের অনেকেই ধীরে ধীরে সরে এসেছিল যৌনকর্মীদের বিষয়ে তাদের পুরানো ধ্যান-ধারণা থেকে। ক্রমশ তাদের মতামত গড়ে উঠল যৌনকর্মীদের সপক্ষে। তাদেরই একজনের পরামর্শ এবং সাহায্যের হাত ধরে শেষ পর্যন্ত তারা পৌঁছে গিয়েছিল তৎকালীন সমবায় মন্ত্রী সরল দেব-এর চেম্বারে। মন্ত্রী মহোদয় তাদের উৎসাহ দেখে রাজি হয়ে গেলেন সমবায় খোলার অনুমতি দিতে। কিন্তু সরকারি দপ্তরের সেই অফিসার বলে উঠলেন, 'স্যার ব্যাপারটা তাহলে কিন্তু আইন অমান্যের পর্যায়ে চলে যাবে...। আইনের অমুক ধারা অনুযায়ী শুধুমাত্র চরিত্রবান লোকেদের জন্য সমবায় গড়ার কথা বলা হয়েছে। এই দেখুন না, লেখা আছে সমবায়ের সদস্যদের গুড মরাল ক্যারেক্টরের অধিকারী হতে হবে...'ইত্যাদি।

মন্ত্রী বললেন, 'কিন্তু তোমাদের আলোচনার সূত্র ধরে তো সৎ চরিত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যাচ্ছে না, আর ওরা যেসব বিতর্ক তুলছে সেগুলোও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাহলে উপায়টা কি?' বার কয়েক আপনমনে মাথা নাড়লেন মন্ত্রী মহোদয়। তারপর চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, চরিত্রের সংজ্ঞা ঠিক করা সমবায় দপ্তরের কাজ নয়। সমাজ কাকে চরিত্রবান আর কাকে দুশ্চরিত্রের বলে চিহ্নিত করবেন সেটা সমাজ সংস্কারকদের ব্যাপার। এই বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে আমার কাজ হলো সমবায় আন্দোলন রাজ্যে কি করে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেইটা দেখা, আর সে ব্যাপারে সাহায্য করা। যৌনকর্মীদের সমবায় গড়ার অনুমতি দিলে কি আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? কিন্তু বড়োবাবু নাছোড়বান্দা, তাই শেষমেশ সরল দেব মহাশয় এসব বাধাবিপত্তি কাটাতে রাজ্য সরকারের সমবায় আইনের ওই বিশেষ ধারাটি বিধানসভায় পেশ করে ওই ধারাটিই আইন থেকে মুছে দিলেন। অনেকে হয়তো ভাবছেন কাজটা খুবই ছোট্ট, কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়ের এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের ফলে এ- রাজ্যে জন্ম নিতে পেরেছিল যৌনকর্মীদের জন্য এবং যৌনকর্মীদের পরিচালিত প্রথম সমবায়। এই সমবায় শুধু এদেশে নয়, এশিয়া মহাদেশে যৌনকর্মীদের মধ্যে গড়ে তোলা প্রথম সমবায়। এই সমবায় সংস্থা যে পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে এনেছিল এ রাজ্যের যৌনকর্মী ও তাদের পরিবারের জীবনে এবং সংস্কৃতিতে তা নিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে এই সমবায়ের তুলনা সারা পৃথিবীতে আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই বিচারে নিঃসন্দেহে বলা যায়, যৌনকর্মীদের এই সমবায় সংস্থা, যার নাম ঊষা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, যৌনকর্মী- সহ সমস্ত সীমান্তবর্তী মানুষদের আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা।

ঊষার বিষয়ে ঢোকার আগে প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার কেন সেদিন এ রাজ্যের যৌনকর্মীরা নিজেদের সমবায় গড়তে এত উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। এর পেছনে আরও একটা ঘটনা রয়েছে। সোনাগাছিতে এইচআইভি/এড্‌স রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি যা অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ-এর মাধ্যমে পরিচালিত হতো, সেই প্রোজেক্টের নীতি নির্ধারকেরা এদেশে প্রথম যৌনকর্মীদের ট্রেনিং দিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে গড়ে তুললেন। তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'পিয়ার-এডুকেটর'। সেদিন অবশ্য অনেকেই এসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে ভ্রু কুঁচকে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিলেন, এসব করে নাকি 'বেশ্যাদের তোল্লা' দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই সর্তক করে দিয়েছিলেন, 'বেশ্যাদের এ ভাবে মাথায় তুললে নাকি দেশ রসাতলে যাবে।' ডান-বাম-মধ্য প্রায় সবপন্থী মানুষদের একটা বড়ো অংশের মধ্যে ছিল ছি-ছি ভাব। কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে নিজেদের মনের কথা বলে ফেলেছিলাম 'বুঝলাম এড্‌স না হয় একটা ভয়ঙ্কর রোগ। কিন্তু সেটা রুখতে এতটা নীচে নামতে হবে?' সরাসরি না

বললেও এই বক্তব্যের অর্থ হলো যৌনকর্মীদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের সমস্যায় মাথা গলানো— একটা 'নিচুমানের কাজ'। এ ব্যাপারে বিদ্বৎজনেদের প্রশ্ন করলে তাদের বাঁধা বুলি ছিল, আসল কাজ হলো মেয়েদের এই পেশা থেকে উদ্ধার করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, কারণ সেটাই হলো উত্তরণের সঠিক পথ...। এসব মানুষজনের সঙ্গে অবশ্য বেশ্যাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না (যদি থেকেও থাকত তা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ)। কিন্তু তারাই এদেশে এদের বিষয়ে 'বাদ' মতবাদ তৈরি করেন, পরোক্ষে চাপিয়ে দেন নিজেদের অবস্থান থেকে। তাই ওই সময়ে যৌনকর্মীদের সমবায় সমিতি তৈরি করার কাজটা খুব একটা সহজ ছিল না। যৌনকর্মীদের রোজগার এবং রোজগারের টাকা কোথায় কি ভাবে থাকে, কে কি ভাবে টাকা নয়ছয় করে সে সব নিয়ে বিদ্যেবাগীশদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না, রাখার প্রয়োজনও বোধ করেননি।

সে যাই হোক, ওই সময় 'চরিত্রহীন' যৌনকর্মীরা কোনো ব্যাংকে ঢোকার সাহস পেতেন না। অবশ্য তাদের মধ্যে দু'একজন দু'একবার যে ব্যাংকে ঢুকে অ্যাকাউন্ট খোলার চেষ্টা করেননি তাও নয়। তবে তাদের প্রথম- বারের অভিজ্ঞতা এমনটাই ছিল যে দ্বিতীয়বার সেদিকে পা মাড়াবার চিন্তাও তারা করেন নি। যে ভাবে ব্যাংকের কর্মীরা তাদের নিয়ে হাসি-মশ্‌করা করত, সে সবের কিছু খণ্ডচিত্র যেদিন পিয়ার এডুকেটেরা আমাদের শোনালেন, তাতে বিষয়টা যে কি ধরণের অপমানকর হয়ে থাকে তা জেনে আমাদের কারুরই ভালো লাগেনি। এছাড়া ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই পরিচয়পত্র— তা সে বাড়িভাড়ার রসিদ, ইলেকট্রিকের বিল কিংবা রেশন কার্ড যাই হোক না কেন, তখনকার দিনে যৌনকর্মীদের কারুর কাছেই তা থাকা সম্ভব ছিল না। গ্রাম থেকে চলে আসা যৌনকর্মীরা শহরে এসে রেশন কার্ড তৈরির হ্যাপাতে ঢুকতে উৎসাহ দেখাতেন না। একে তো নতুন জায়গা, জানাশোনা কোনো লোকজন নেই, কোথায় কার কাছে যেতে হবে, কি ভাবে কথা বলতে হবে এসব তাদের জানার কথা নয়। আর যৌনপেশার চাপে সে ফুরসতই বা কোথায়! দ্বিতীয়ত এদেশে আইন অনুযায়ী (যার নাম হলো ইটপা বা আইটিপিএ) যৌনপেশার জন্য কেউ বাড়িভাড়া দিতে পারেন না, কারণ আইনত তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত। যে কারণে এলাকার বাড়ির মালিকেরা কোনো যৌনকর্মীকে বাড়িভাড়ার রসিদ, কিংবা সাব মিটার বসিয়ে ইলেকট্রিসিটির বিলে যৌনকর্মীদের নাম তোলার রাস্তায় যেত না। এদের স্বল্প কিছুজনার ভোটার কার্ড গ্রামের বাড়ির ঠিকানায় থাকলেও শহরে এসে নতুন করে তা বদলানো বা তৈরি করার রাস্তায় কেনই বা যাবে তারা? আর কে তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করবে, কার-ই বা দায় পড়েছে এসব কাজে। এলাকার বাবু, মস্তান, দালাল, বাড়িওয়ালা থেকে শুরু করে শহরের বিদ্যাবাগীশ বাবুমশাই কিংবা বিপ্লবের আঁচ পোহানো নানান রঙের বিদ্রোহীদের এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিল না, আর তা না থাকারই কথা, বলা বাহুল্য ওই পেশায় নিযুক্ত মেয়েদের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। তা হলে কি ভাবে তারা তাদের রোজগারের টাকা-পয়সা জমাতেন? এবং যখন ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ত, তখন কোথায় বা কার কাছ থেকে তারা কি ভাবে ঋণ নিতেন? এই সব বিষয় জানার পর সত্যি বলতে কি, আমাদের চক্ষুও চড়কগাছ হলো।

যৌনকর্মীরা তাদের রোজগারের টাকা জমিয়ে রাখতে চাইলে হয় তার মালকিনের কাছে নয়তো 'বাবুর' কাছে গচ্ছিত রাখতেন। 'বাবু' অর্থাৎ ওই এলাকার কিংবা এলাকার বাইরের কোনো পুরুষ যে যৌনকর্মীর সঙ্গে একটা সম্পর্কের গাঁটছাড়ায় বাঁধা থাকে। এই সম্পর্কটা অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের আদলে গড়া। অবশ্য অধিকাংশ 'বাবুর' নিজস্ব আলাদা একটা সংসার শহরে কিংবা গ্রামে থাকত। যৌনকর্মী সেক্ষেত্রে 'উপপত্নী' কিংবা তার থেকেও আরও একটু বেশি। কারণ, আমরা পরে অনুসন্ধান করে দেখেছি ওই বাবুর খাওয়া-পরা তো বটেই বহুক্ষেত্রে যৌনকর্মী তার বিবাহিত পরিবারের ভরণপোষণও চালিয়ে থাকে, কখনও ভালোবেসে কখনও বা 'দায়ে পড়ে'। সে এক অন্য গল্প।

মালকিন কিংবা বাবু ছাড়াও অন্য যে রাস্তায় যৌনকর্মী টাকা জমাতে পারে তা মূলত এক ধরণের অনামী চিটফান্ড বা পঞ্জি স্কিমের মাধ্যমে। তখনও এ শহরে, সারদা, এমপিএস কিংবা রোজভ্যালির মতো নামী পঞ্জি স্কিমের প্রকাশ ঘটেনি। আর ওই সব চিটফান্ড ছিল মূলত ব্যক্তি বা পরিবারভিত্তিক, যারা নিজেরা অথবা তাদের নিযুক্ত দালালরা যৌনকর্মীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের প্রতিদিনের রোজগারের টাকা তুলে নিয়ে যেত, একটা মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে যে, বছরের শেষে একটা বড়ো অঙ্কের টাকা সে তুলে দেবে ওই মেয়েটির হাতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুদিন পর সেই দালালকে ওই এলাকায় আর দেখা যেত না, কয়েকমাস পর তিনি বেপাত্তা হয়ে যেতেন। বহু খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলাম দু'চার জন কিছু বছরের ব্যবধানে স্বল্প কিছু টাকা ফেরত পেলেও একজনও সেই মোটা অঙ্কের টাকা পাননি। অধিকাংশ যৌনকর্মী তার রোজগারের টাকা হারিয়েছেন এ ভাবে এবং একাধিকবার। কলকাতা ও পাশাপাশি জেলা থেকে যে সব মহিলারা সোনাগাছিতে এসে যৌনপেশায় জুতেছিলেন তারা সাধারণত পনেরো দিন বা এক মাস অন্তর বাড়িতে যেতেন বাবা,

মা, ভাই বোনদের হাতে রোজগারের টাকা তুলে দিতে। অধিকাংশ মালকিন অবশ্য রোজগারের টাকা বাড়ি যাওয়ার দিন যৌনকর্মীর হাতে তুলে দিতেন। জমা টাকার হিসেব-নিকেশ নিয়ে মালকিন আর যৌনকর্মীর মধ্যে বাদবিতন্ডা বা মন কষাকষি যে হতো না তেমনটা নয়, তবে যৌনকর্মীদের কাছে এছাড়া 'মন্দের ভালো' অন্য কোনো রাস্তাও খোলা ছিল না। আর বাবুদের কথা? এদের শতকরা ৯০ শতাংশ হলেন এলাকার ভাষায় 'খানেওয়ালা বাবু'। এদের পকেটে একবার টাকা ঢুকলে তা যে ফেরত আসবে না, এটা মোটামুটি ভাবে ধরে নেওয়া যায়। তবে ওই বাকি ১০ শতাংশ 'দেনেওয়ালা বাবুরা' ছিল এদের থেকে আলাদা।

এ তো গেল টাকা জমানোর কথা। কিন্তু যৌনকর্মীদের যখন টাকা ধার নেওয়ার দরকার পড়ে তখন তারা কি করে? বিশেষত যখন তার ভাই স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ভর্তি হবে, হোস্টেলে থাকবে তখন তো একটা ভালো অঙ্কের টাকা চাই। টাকার দরকার পড়ে বোনের বিয়ের যৌতুক দিতে কিংবা বৃদ্ধা মায়ের চিকিৎসা কিংবা বাবার বন্দকি জমি ছাড়িয়ে আনতে। এসব ছাড়াও মাঝে-মধ্যে লোকাল থানার বড়োবাবুর পকেটে টান পড়লে রেইড করে যৌনকর্মীদের থানায় তুলে নিয়ে যায়। (ইটপা আইনের ধারা অনুযায়ী 'সলিসিটিং' অর্থাৎ কাস্টমারকে ফুসলানোর অভিযোগে পুলিশ যৌনকর্মীকে বেধড়ক মার খিস্তি সহ গাড়িতে তুলে প্রায়শই থানায় নিয়ে গিয়ে থাকে) তখন তাকে ছাড়িয়ে আনতে মোটা টাকার ঘুষ দিতে হয়। বলা নিস্প্রয়োজন, এ ধরণের বহু কাজে বেচারা যৌনকর্মীকে যেন তেন প্রকারেন সেই টাকাটা ধার নিতে হবে, কখনও ভালোবাসার তাগিদ থেকে (পরিবারের ক্ষেত্রে) কখনও বেঁচে থাকা, নিজের রোজগারে ফিরে আসার দায় থেকে। টাকা ধার দেওয়ার জন্য যৌনপল্লিগুলিতে কিছু লোক টাকার থলি নিয়ে সব সময় ঘোরাফেরা করে। টাকা ধার দিতে তারা মুক্তহস্ত। একটা তেলচিটে খাতা নিয়ে তখন তারা হাজির হয়ে যাবে যৌনকর্মীর ঘরে। শর্ত একটাই, প্রতিদিনের রোজগারের টাকা থেকে তাকে সুদ গুনতে হবে। একদিন সুদের টাকা দিতে না পারলে পরের দিন সেটা অনেকটা বেড়ে যাবে, দু'দিন বাদে হয়তো সেটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে ইত্যাদি। এরকম নানান ধরণের নিয়মকানুন তারা বেশ মাথা খাটিয়ে তৈরি করেছেন এই পেশায় নিযুক্ত মেয়েদের জন্য। এই সব টাকা ধার দেওয়ার স্কিমের বিভিন্ন নামও রয়েছে যেমন চটা, কিস্তি ইত্যাদি।

আমি একবার ক্যালকুলেটর বার করে, টাকা ধার নেওয়ার যে সব ব্যবস্থাপনা ওই এলাকায় রয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে কম সুদে টাকা কি করে ধার পাওয়া যায় সেটা হিসেব করতে গিয়ে দেখি, বাৎসরিক সুদের হার সব থেকে কম হলো ৩০০ শতাংশ। আর যারা এক-দু'বার সুদের কিস্তি দিতে ভুলে গেছে বা দিতে পারেনি তাদের বেলায় সেটা বাৎসরিক ১০০০ শতাংশ বা তার বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। মোটামুটি ভাবে বলা যায় সুদের টাকা শোধ করতেই অনেক যৌনকর্মীর জীবন শেষ হয়ে যাবে মূলধন শোধ করা তো বহু দূরের কথা। তবে মিথ্যে কথা বলব না, দাদনকারীরা ধার করা মূল টাকার অঙ্ক ফেরত নেওয়ার বিষয়ে জোরাজুরি করে না। তারা সুদের টাকাতেই খুশি। তাই আমরা যখন সমবায় তৈরি করার কথা বললাম তখন যৌনকর্মীদের সবাই যে পুরো বিষয়টা বুঝে উঠতে পেরেছিল তা হয়তো নয়, তবে যৌনকর্মীদের নেতৃস্থানীয়াদের কাছে সমবায় গড়া যে হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতন একটা বিষয় সেটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

দপ্তরের অনুমতি নিয়ে সমবায় তো তৈরি হলো, কিন্তু এবার সদস্য বাড়াতে হবে। পিয়ার এডুকেটররা তখন দলবেঁধে মেয়েদের দোরে দোরে গিয়ে বোঝাতে শুরু করল সমবায়ের সদস্য হলে কি লাভ হবে? দরকারে কি ভাবে টাকা ধার নেওয়া যাবে ইত্যাদি। ব্যাপারটা যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, তা কিন্তু হলো না। পিয়ার দিদিদের বোঝানোর, উল্টোদিকে দাদনকারীরা, পাড়ার মস্তানরা, এলাকার 'বড়োদাদারা' সবাই মিলে কোমর বাঁধল কি করে ঊষা সমবায় ভেস্তে দেওয়া যায়। মেয়েদের ঘরে গিয়ে শাসানি এবং নানান ধরণের অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে শুরু করল। অনেক মেয়েই তখন ভয়ে পিছিয়ে গেল। তবু পিয়ার এডুকেটরদের অদম্য ইচ্ছা আর লেগে থাকার সুবাদে স্বল্প কিছু নতুন সদস্য তখন ঊষাতে বই খুলতে শুরু করেছে। এরকম একটা কাজের দিনে তাদের উপর চড়াও হলো গুন্ডারা, বোমা ছোঁড়া হলো পিয়ার কর্মীদের লক্ষ্য করে, অবশ্য সে যাত্রায় সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে মারা যায়নি কেউ। কিন্তু এলাকার মেয়েরা ভীষণ রকম দমে গেল। সদস্য সংখ্যা কয়েকশোতে আটকে আছে তখন। আমরা হাল না ছেড়ে উৎসাহ যোগাচ্ছি প্রতিদিন মিটিং-মিছিল করে, এলাকায় মেয়েরা যাতে সাহসে ভর করে ঊষায় খাতা খুলতে পারে। এলাকার ক্লাব, দোকানদার ইত্যাদির সঙ্গেও বসে আলোচনা চালাচ্ছি যাতে তারা মেয়েদের উপর চাপ সৃষ্টি না করে।

এরকম একটা সময়ে, বছরটা ১৯৯৬, এপ্রিল মাসের এক আগুন ঝরা দুপুরে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউটে আমার চেম্বারে হাজির হলেন এক ভদ্রলোক। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। নমস্কার বিনিময়ের পর নাম জিজ্ঞেস করায়, রুক্ষ গলায় শুরু করলেন সেই বিশালদেহী মানুষটি কোনো রাখঢাক্ না রেখে, 'এসব আপনি কি শুরু করেছেন? আপনাদের তো হেলথের কাজ করার কথা।

কো-অপারেটিভ খোলার তো কথা ছিল না।'

আলোচনার কোনো সুযোগই ছিল না। এমন চড়াও হয়ে প্রশ্ন করায় আমি রাগত স্বরেই বললাম, 'সোনাগাছিতে কি করব না করব সেটা আমাদের বিষয়, আপনাকে আমি তার কৈফিয়ত দিতে যাব কেন?' এবার সেই ভদ্রলোক মুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু এবার গলার স্বর একদম খাদে নামিয়ে দাঁত চেপে বললেন, 'আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি ওখানে আর যাবেন না, ফের যদি কখনও আপনাকে সোনাগাছিতে দেখি, বলেই এক ঝটকায় আমার হাতটা টেনে নিয়ে তার কোমরে লটকানো ধাতব বস্তুটার গায়ে ছুঁইয়ে প্রায় হুকুম করার স্বরেই বললেন, ওখানে গেলে কি হবে বুঝতে পারছেন?'

আমি তো হতভম্ব। সম্বিত ফিরে পাওয়ার আগেই সে মানুষটা তখন দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেছে। কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আর সত্যি কথা বলতে কি মনে মনে ভয়ও পেয়েছিলাম। ছাত্র আন্দোলন ছাড়াও নানান সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে কম-বেশি যুক্ত ছিলাম অনেকদিন, মিছিল-মিটিং করেছি কিন্তু সমবায় গড়তে গিয়ে বন্দুকের গুলি খেয়ে মরতে হবে, এটা কোনোদিন ভাবিনি।

ঊষার জন্মলগ্ন থেকেই জড়িয়ে আছে এমন অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা, যা বলতে গেলে একটা বই লিখতে হবে। এত সব সমস্যা আর বাধা-বিপত্তির পেছনের মূল কারণটা যে তাদের পেশা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কলকাতা শহরে যে সব মেয়েরা সমবায় গড়বে বলে সেদিন কোমর বেঁধেছিল, তাদের চরিত্র নিয়ে টানাটানির প্রয়োজনই পড়ত না, যদি তারা সমাজের অন্য শ্রেণির মানুষ হতেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা সমবায় গড়তে চাইলে কি তাদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হতো? বিশ্বাস হয় না। অন্যদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে অন্য যে কোনো পেশার মানুষদের চেয়ে যৌনকর্মীদের কাছে সমবায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ছিল অনেক জরুরি এবং অনেক গভীরের বিষয়।

ঊষা শুধু একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের প্রয়োজনীয়তা মেটায় নি, এর বাইরেও এক বড়োসড়ো রাজনৈতিক ভূমিকা রেখেছে। ঊষা যৌনকর্মীদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের কার্যত এক হাতিয়ার। যৌনকর্মীর পরিচয়ে সমবায় রেজিস্ট্রি করা ছিল তারই প্রথম ধাপ। অধিকাংশ মেয়েদের কাছে ঊষার পাশবই আজ তাদের একমাত্র পরিচয় পত্র। অর্থাৎ নাগরিক হিসাবে তার অস্বিত্ব সে প্রমাণ করতে পারে ঊষার বই থেকে। পরবর্তী পর্যায়ে সে চাইলে রেশন কার্ড তৈরি করা, বিমা যোজনায় অংশ নেওয়া থেকে শুরু করে বৃদ্ধা ভাতা পাওয়ার সুযোগ গড়ে নিতে পারে ঊষার পাশবইকে তার নাগরিক স্বীকৃতির পরিচয় পত্র হিসেবে ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, এ রাজ্যের ইলেকশন কমিশন ঊষার পাশবইকে পরিচয় পত্র হিসাবে গণ্য করে তাদের ভোটার কার্ড তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ ভোটার হিসেবে সে আজ নিজেকে দাঁড় করাতে পারে। একদিন যে ব্যাংক কর্মীরা তাদের নিয়ে হাসাহাসি করেছে, আজ ঊষার বাড়বাড়ন্ত দেখে (বর্তমানে ঊষার বাৎসরিক লেনদেন ১৭ কোটি টাকা) তারাই এগিয়ে এসেছেন যৌনকর্মীদের ব্যাংকের পাশবই খুলে দিতে। ঊষার কপালের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে প্রথম এগিয়ে এসেছিল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। সোনাগাছির যৌনকর্মীরা তখন বলেছিলেন, আপনার ব্যাংকে আমরা টাকা রাখতে পারি যদি আমাদের পেশার স্বীকৃতি মেনে নিয়ে আমাদের নামের পাশে যৌনকর্মী কথাটা লিখতে পারেন। কয়েকটা দিন গড়িমসি করার পর সেও মেনে নিয়েছে ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তারা। ঊষা সফল না হলে তা কি সম্ভব হতো? যৌনকর্মীদের হিম্মত গড়ে দিয়েছে ঊষা। এখন স্বাস্থ্যবিমা থেকে জীবনবিমার অফিসাররা যৌনকর্মীদের অফিসে আনাগোনা করেন। তাদের বিমা ইত্যাদি করিয়ে দেওয়ার জন্য পিছু লেগে থাকেন। দিন বদলের গল্প তো এ ভাবেই সত্যে পরিণত হয়। যৌনকর্মীরা তাদের অর্জিত অর্থ জমিয়ে রাখতে পারে, প্রয়োজনে স্বল্প সুদে ঋণ নিতে পারে, যে জায়গা থেকে আজ তাদের নিজের বাড়ি, ঘর তৈরি করছে। এই পেশায় যুক্ত মেয়েদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে, পাল্টাচ্ছে জীবনের ধারা, সংস্কৃতি। আজ তাদের আত্মবিশ্বাস যে জায়গায় পৌঁছেছে সেখান থেকে স্পর্ধা দেখানোর সাহস তো জন্মাবেই।তাই শুধু নিজের বা নিজের পরিবারের কথা ভেবে থেমে থাকে না, তারা আজ পৌঁছে যায় হতদরিদ্র ও দুর্বল মানুষদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়াতে। তা সে আমলাশোলের আদিবাসী কিংবা শহর কলকাতার গৃহশ্রমিক কিংবা সমুদ্র উপকূলের মৎসজীবী মহিলা— তাদেরকে একত্রিত করতে, পরিষেবা পৌঁছে দিতে হাজির থাকে তারা, কারণ তাদের সে কাজে রসদ জোগায় ঊষা। আজ তাই তারা রঙিন মশাল জ্বালতে পারে সমাজের পিছিয়ে রাখা আরও অনেক নারীপুরুষের মনে— আর সেখানেই ঊষার সফলতা, সেখানেই ঊষার গর্ব কিংবা স্পর্ধা যাই বলা হোক না কেন।

স্মরজিৎ জানা